বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, বিয়াল্লিশতম খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪৩১/ডিসেম্বর ২০২৪

গ্রন্থ-পর্যালোচনা

মুহম্মদ ইউসুফ সিদ্দিক, *নিদ্রিত শিলার মুখরিত লিপি : বাংলায় আরবী-ফার্সী লেখমালা (১২০৫- ১৪৮৮)*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০২১
পৃষ্ঠা ৬৫২, মূল্য: ১,৫০০ টাকা

মুহাম্মদ ইউসুফ সিদ্দিক রচিত আলোচ্য গ্রন্থখানি সম্প্রতি প্রকাশিত শিলালিপিভিত্তিক একখানি অতি মুল্যবান গ্রন্থ। বিজ্ঞ গবেষকের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আছে কঠিন শিলা বা প্রস্তরের ওপর রচিত শিলালিপি। মধ্যযুগের আরবি-ফারসি শিলালিপিগুলি বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অমূল্য সম্পদ। শিলা বা পাথরের মসৃণতল খোদাই করে অভীষ্ট বাণী লিপিবদ্ধ করা হয়, যা শিলালিপি নামে অভিহিত হয়ে থাকে। মধ্যযুগে কাগজের প্রচলন শুরু হলেও তা ছিল অতিব দুর্লভ ও ব্যয়বহুল; উপরন্তু তা সহজপাচ্য ও ক্ষয়িষ্ণু ছিল। এজন্য সে যুগের রাজা-বাদশাহ তাঁদের কীর্তিকলাপ সংরক্ষণে টেকসই মাধ্যম হিসেবে শিলালিপি প্রযুক্তি বেছে নিয়েছিলেন। সংগত কারণেই শিলালিপির ভাষণ হতো সংক্ষিপ্ত। মুসলিম শাসনামলে (১২০৪-১৭৫৭) বাংলায় এযাবৎ এরূপ চার শতাধিক শিলালিপির সন্ধান পাওয়া গেছে। দেশ-বিদেশের পণ্ডিতগণ বিভিন্ন সময়ে এসব শিলালিপি সংগ্রহ, পাঠোদ্ধার ও আলোচনা-গবেষণা করে বাংলার ইতিহাস নির্মাণে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছেন। এগুলির অধিকাংশই আরবি ও ফারসি ভাষায় লিপিকৃত; অনেক শিলালিপিতে আরবি-ফারসি ভাষার মিশ্রণও রয়েছে। দু' একটি বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার শিলালিপিও পাওয়া গেছে।

শিলালিপিগুলি প্রণীত হয়েছে মূলত বিভিন্ন স্থাপনানির্মাণ উপলক্ষ্যে। এগুলি হলো মসজিদ, মাদ্রাসা, দুর্গ, রাজপ্রসাদ, তোরণ বা নগরের প্রবেশদ্বার, ফটক বা দুর্গের প্রবেশদ্বার, রাজপ্রাসাদের প্রবেশদ্বার, মিনার বা স্মৃতিস্তম্ভ, সমাধিভবন, সমাধিবেদী, খানকাহ, মাজার বা পীরের দরগাহ, ঈদগাহ, ইমামবাড়া, সিকায়াহ্ বা জলসত্র, দিঘি, পুল, রাস্তা ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে মসজিদ-মাদ্রাসার সংখ্যা সর্বাধিক; এরপরে আছে সুফি পির-দরবেশদের খানকাহ, দরগাহ, ও সমাধিগৃহ। ব্যয়বহুল এসব স্থাপনা নির্মাণের ও শিলালিপি মুদ্রণের কাজে মুখ্যত শাসকশ্রেণি ও ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ জড়িত ছিলেন। শিলালিপির বাণীতে নির্মাতা ও পৃষ্ঠপোষক রূপে তাঁদেরই নাম-ধাম-কাল পাওয়া যায়।

সাড়ে পাঁচশো বছর ধরে এদেশে এরূপ মূল্যবান স্থাপনা, শিলালিপি, মুদ্রা ইত্যাদি নির্মিত হলেও সেযুগের পণ্ডিতগণের এগুলির ঐতিহাসিক তাৎপর্য উপলব্ধি ও মূল্যায়ন করার জ্ঞান ও মানসিকতা ছিল না, যার ফলে সমকালের ও পরবর্তীকালের অনেককিছু ধ্বংস হতে বসেছিল। প্রথমে দেশীয় পণ্ডিত গোলাম হুসেন সলিম যোধপুরী ও তাঁর শিষ্য সৈয়দ ইলাহি বকশ গৌড়-পান্ডুয়ার শিলালিপির

প্রতি আকৃষ্ট হন। প্রথমজন রিয়াজ-উস-সালাতিন' (১৭৮৮) এবং দ্বিতীয়জন 'খুরশিদ-ই-জাহাননামা' নামক ইতিহাসগ্রন্থে তাঁদের সংগৃহীত শিলালিপির উপাদান ব্যবহার করেন। ইলাহি বকশ তাঁর রচনায় পূর্বের এবং নিজের সংগৃহীত মোট ৪২টি শিলালিপির উপাদান ব্যবহার করেন। (পৃ. ৭৯)। ইংরেজ শাসনামলে প্রাচ্যবিদ্যানুরাগী কতিপয় আমলা উদ্যোগী হয়ে এসব ঐতিহাসিক নিদর্শন অনুসন্ধান, সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে প্রথম লোকচক্ষুর সামনে নিয়ে আসেন। এক্ষেত্রে ফ্রান্সিস বুকানন হ্যামিল্টন, এইচ ব্লকম্যান, উইলিয়াম ফ্র্যাঙ্কলিন, হেনরি ক্রেইটন, হেনরি বেভারিজ প্রমুখের নাম করা যায়। তারপর দেশীয় পণ্ডিতগণ এগিয়ে আসেন; বিশ শতকে তাঁরা শিলালিপি বিষয়ক কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থও প্রণয়ন করেন। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো আবিদ আলি খানের *Memoirs of Gour Pandua* (১৯৩১), শামসউদ্দিন আহমদের *Inscriptions of Bengal* (১৯৩৩-৩৪), আহমদ হাসান দানির *Bibliography of Muslim Inscriptions,* আবদুল করিমের *Corpus of Arabic-Persian Inscriptions* (১৯৯২) ইত্যাদি। এরূপ গবেষণার ও গ্রন্থরচনার ধারা থেমে যায়নি। একুশ শতকের গোড়ার দিকে মহম্মদ ইউসুফ সিদ্দিক লিখেছেন *Arabic and Persian Inscriptions of Bengal* (২০১৭) গ্রন্থ; এতে সর্বাধিক সংখ্যক ৪২৫টি শিলালিপির বিবরণ রয়েছে, যা অন্য সকল গ্রন্থের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেছে। আরবি-ফারসি শিলালিপি নিয়ে দেশি ও বিদেশি পণ্ডিত দ্বারা এযাবৎ যা কিছু রচিত হয়েছে, তার সবই ফারসি ও ইংরেজি ভাষায়; বাংলা ভাষায় অনুরূপ কোন গ্রন্থ প্রণীত হয়নি। মহম্মদ ইউসুফ সিদ্দিকই প্রথম 'নিদ্রিত শিলার মুখরিত লিপি' (২০২১) গ্রন্থ প্রণয়ন করে দীর্ঘ দুশো বছরের এরূপ শূন্যতা দূর করেন। এরজন্য তিনি মাতৃভাষাপ্রেমিক সকলের কাছে ধন্যবাদের পাত্র।

আরবি-ফারসি শিলালিপি সংক্রান্ত বৃহৎ আকারের এই গ্রন্থের 'নিদ্রিত শিলার মুখরিত লিপি' নামকরণটি প্রথমেই পাঠকের নজর কাড়ে। কঠিন শিলা বা পাথর নিদ্রিত, নিস্তব্ধ; কিন্তু তার গায়ে খোদাইকৃত লিপিগুলি মুখর বা সরব। রোমান্টিক শিরোনামের এই গ্রন্থে কী আছে? আরবি-ফারসি বিভাষা, তার ওপর আরবি হরফের অলংকৃত লিখনশৈলী দেশীয় পাঠকের কাছে কঠিন শিলার মতই দুর্বোধ্য ও রহস্যময় ছিল। কিন্তু লেখকের ভাষার সৌকর্যে এবং স্বচ্ছ বর্ণনার গুণে তা অনেকটাই সরস ও উপাদেয় হয়ে উঠেছে।

শিলালিপির বহুমাত্রিক দিক রয়েছে। প্রথমত সংশ্লিষ্ট স্থাপনার শোভাবর্ধন ও দৃষ্টিনন্দন রূপদান এর একটি বিশিষ্ট দিক। এর গঠনপ্রকৃতি ও লিখনশৈলী দর্শনসুখকর। দ্বিতীয়ত শিলালিপিতে উৎকীর্ণ বা খোদাইকৃত বাণী, যার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। স্থাপনার প্রকৃতি অনুযায়ী শিলালিপির এরূপ বাণীতে নানাবিধ তথ্য রয়েছে, যেমন স্থাপনার নাম, নির্মাতার নাম, সমকালের শাসনকর্তার অথবা পৃষ্ঠপোষকের নাম-ধাম, শাসকের বর্ণাঢ্য পদবি, উপাধি স্থাপনা ও স্তুতিবচন, কোরান-হাদিসের সংশ্লিষ্ট উদ্ধৃতি, স্থাপনা বা প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি অনুযায়ী রাজনৈতিক, ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক,

শৈক্ষিক, দান-অনুদান প্রভৃতির বার্তা, নির্মাণস্থান, নির্মাণকাল ইত্যাদি। সংখ্যায় কম হলেও বাণীপ্রণেতা ও লিপিকরের নামও পাওয়া যায়। তথ্যপ্রযুক্তির শূন্যতার যুগে এসব উপাদানের মূল্য ছিল অসীম ও অতুলনীয়। বস্তুত মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাস রচনায় শিলালিপিগুলি অন্যতম উৎস্যরূপে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

শিলালিপি একটি যৌথশিল্পকর্ম। একটি পূর্ণাঙ্গ ও আদর্শ শিলালিপি নির্মাণে একাধিক ব্যক্তির ভূমিকা থাকে। এর নির্মাণ প্রক্রিয়া ও বিভিন্ন ব্যক্তির ভূমিকা সম্পর্কে লেখক বলেন, "কোনও সুলতান একবার কোন শিলালিপি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিলে প্রথম কাজ ছিল পংক্তি ক'টি রচনা করা। এ কাজে তখনকার মক্তব বা মাদ্রাসার অধ্যাপকদের মধ্যে কবিপ্রতিভা আছে এমন কাউকে নিয়োগ করা হত। তাঁদের রচনা সুলতানের মনোমত হলে তা যেত একজন চারুলিপিকর অর্থাৎ ক্যালিওগ্রাফারের কাছে। চারুলিপিকর (আরবি) অক্ষরকে শৈল্পিক রূপ দিতেন। সে রূপ ফুটত সে যুগের তুলট কাগজের ওপর। এরপর ফলকের গায়ে কাঠকয়লা দিয়ে সেই কাগজে আঁকা ছাঁদ ফুটিয়ে তোলা হত পাথরে, এবং শেষে দক্ষ খোদাইকর তা খোদাই করতেন। অক্ষরকে কি মুনশিয়ানায় এক-একটা থিমের আওতায় আনতেন সেই শিল্পী। বোঝাই যায়, প্রতিভাবান লিপিকরদের মর্যাদা ছিল সুউচ্চ, তাঁদের কেউ কেউ খ্যাত ছিলেন যারিন দাস্ত বা স্বর্ণহস্ত নামে।" [পৃ. ১৫]। নির্মাতা ও পৃষ্ঠপোষক ছাড়াও বাণীরচয়িতা, লিপিকর ও খোদাইশিল্পী রয়েছেন। এর অতিরিক্ত পাথর-কাটা কারিগরও নিয়োগ করা হতো। তার কাজ ছিল পাথর ঘসামাজা করে সমতল ও মসৃণ করা এবং পাথর কেটে লেখাগুলি উঁচু বুটিদার রূপে ফুটিয়ে তোলা। [ঐ, পৃ. ৬৫]।

এখন গ্রন্থের সূচিপত্রের দিকে নজর দেওয়া যাক। গ্রন্থে মোট ৮টি অধ্যায়ে মূলবিষয় আলোচিত হয়েছে: অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে প্রারম্ভে আছে প্রতীকচিহ্ন, বর্ণান্তর নীতি, শব্দ সংক্ষেপ, পটভূমি, মুখবন্ধ, প্রাক্‌কথন, বই সম্পর্কে কিছু কথা, ইসলামী শিল্পকলা ও বঙ্গীয় সংস্কৃতি, আর অন্তভাগে আছে পরিশিষ্ট, গ্রন্থপঞ্জী, নির্ঘন্ট ও মানচিত্র। মূল বিষয়বস্তুর মুখ্য দু'টি অংশ- প্রথমাংশের ৬টি অধ্যায়ে (পৃ. ৪১-২৫৬) আছে শিলালিপি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য, তত্ত্ব, বৈচিত্র, বৈশিষ্ট্য ও ইতিহাস সম্পর্কিত বিশ্লেষণমূলক আলোচনা এবং দ্বিতীয়াংশে দুটি অধ্যায়ে (পৃ. ২৫৭-৫৫৫) আছে সংকলিত শিলালিপির মূল টেক্সটসহ কন্টেক্সট ও টেক্সচারের বর্ণনামূলক আলোচনা। উল্লেখ থাকে যে, গ্রন্থে ১২০৫ থেকে ১৪৮৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ বখতিয়ার খলজি থেকে ইলিয়াস শাহী রাজবংশের শাসনামল পর্যন্ত প্রাপ্ত ১০৬টি শিলালিপি সংকলিত ও আলোচিত হয়েছে।

প্রথমাংশের ৬টি অধ্যায় লেখকের মৌলিক গবেষণার ফল। এখানে তিনি দেশের ও বিদেশের শিলালিপি সংক্রান্ত বহু বিষয়ের অবতারণা ও তুলনামূলক আলোচনা করেছেন; বিশেষ করে দেশের শিলালিপি সম্বন্ধে চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর আলোচনার মধ্যে যে দুটি মুখ্যবিষয় গুরুত্ব পেয়েছে, তা হলো আরবিলিপিবিদ্যা ও চারুলিপিশৈলী বা চিত্রকলা।

হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি হোক, ঢালাইকৃত তাম্রলিপি অথবা খোদাইকৃত হোক, প্রাচীনকালের কোনো ভাষায় রচিত কোনো লেখার পাঠোদ্ধার একটা বৈজ্ঞানিক বিদ্যা বলে পরিগণিত হয়। মধ্যযুগের হস্তলিখিত বাংলা পাণ্ডুলিপিগুলি এযুগের পণ্ডিতের কাছেও গ্রিক ভাষা বলে প্রতিভাত হয়, তার প্রধান কারণ বাংলা হরফের লিখনপদ্ধতি ছিল বিভিন্ন প্রকৃতির। প্রাচীন ও মধ্যযুগের আরবি-ফারসি শিলালিপির ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। আরবি ও ফারসি দুটি ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভাষা হলেও উভয় ভাষার হরফ বা লিপি অভিন্ন। প্রাচীন পুস্তকাদিতে যে লিপি ব্যবহার করা হয়, শিলালিপিতে ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায়শই বিশেষ বিশেষ লিখনপদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। এরূপ লিখনরীতির ভিন্ন ভিন্ন নামও পাওয়া যায়, যেমন না, সুলস্, কুফি, তুঘরা ইত্যাদি। লেখকের বিবরণ অনুযায়ী নাস্খ হলো 'নমনীয়তা বিশিষ্ট জড়িয়ে লেখা পদ্ধতি', সুল্স হলো বাঁকা টান দিয়ে লেখার ধরন, কুফি জ্যামিতিক আকৃতির সোজাসুজি ও খাড়াখাড়ি কৌণিক লেখার পদ্ধতি এবং তুঘরা সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উল্লম্বভাবে মোটা হরফ। [পৃ. ৪৮-৪৯] লেখকের মতে, উক্ত চারটি প্রধান পদ্ধতি ছাড়াও বাংলায় এযাবৎ প্রাপ্ত শিলালিপির অন্যান্য লিখনরীতি বা ধরন হলো রিকা, রুক'আ, তাওকী, রায়হানী, মুহাক্কাক্, বিহারি, ইজাযাহ ইত্যাদি। [পৃ. ১৭১] তিনি 'বাংলার স্থাপত্যে আরবী-ফার্সী চারুলিপির বৈচিত্র্য' শিরোনামে পঞ্চম অধ্যায়ে মূল শিলালিপি, বর্ণ ও বর্ণগুচ্ছের চিত্রের উল্লেখসহ এসব লিখনপদ্ধতির বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। ১৩৭৪ সালে নির্মিত পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদের কেন্দ্রীয় মিহরাবের ওপর স্থাপিত শিলালিপিতে কুফি ও সুল্স উভয় লিপির মিশ্রণ রয়েছে। লেখক বলেন, "এই শিলালিপিতে যুগপৎ দুই প্রকার লিখনরীতি ব্যবহৃত হয়েছে। মোটা অক্ষরে লিখিত সুল্স রীতির লেখাগুলো পুরো প্যানেলের প্রেক্ষাপট জুড়ে প্রাধান্য বিস্তার করেছে। সুল্স লেখার দণ্ডায়মান খাড়া রেখাগুলোর উপরের প্রান্তে ক্ষুদ্রাকৃতি সরল ছাঁদের কূফীঢঙে লিখিত একটি লাইন শিলালিপির সৌন্দর্যকে দারুণভাবে বৃদ্ধি করেছে।" [পৃ. ১৭২] উল্লেখ্য যে, মক্কার পবিত্র কাবার কালো কাপড়ের আচ্ছাদনে (কিওয়া) কোরানের আয়াত বুনন-প্রক্রিয়ায় সুল্স রীতি অনুসৃত হয়েছে। [পৃ. ৪৮] ১২২১ সালে বীরভূমের সিয়ানে প্রাপ্ত বাংলার প্রথম শিলালিপিতে কিছুটা রিকা রীতির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। তবে এদেশে তুলনামূলকভাবে নাস্খ ও তুঘরা পদ্ধতির লিপিশৈলী অধিক জনপ্রিয় ছিল। গ্রন্থের এই অধ্যায়টি সম্পূর্ণ অভিনব ও অতীব মূল্যবান।

'বাংলার শিলালিপিতে উৎকীর্ণ উপাধি ও পদবির বৈচিত্র্য' শিরোনামে ষষ্ঠ অধ্যায়টিও সম্পূর্ণ অভিনব, তথ্যসমৃদ্ধ ও জ্ঞানগর্ভ। লেখক আরবি-ফারসি ভাষায় বর্ণিত সর্বমোট ২৫২টি এরূপ উপাধি-পদবির উল্লেখসহ সেগুলির অর্থ ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন। শিলালিপির নির্মাণ কাজে যাঁরা জড়িত ছিলেন, প্রধানত তাঁদেরই 'ইসম' বা মূলনামের নসব বা বংশগত উপাধি, বিবিধ 'লকব' বা উপাধি ও পদবি সংযুক্ত হয়েছে। পদবি দু' প্রকার- বংশগত, যেমন খলজি, সূর, কররানি এবং নিসবা বা স্থানবাচক পদবি, যেমন তাব্রিজি, কিরমানি জুনিয়াঈ ইত্যাদি। অধিকাংশ শিলালিপিতে রাজপুরুষ ও ধার্মিক ব্যক্তির নামের সাথে এরূপ উপাধি ও পদবি ব্যবহৃত হয়েছে। রাজপুরুষ বলতে প্রধান

শাসক ও তাঁর সহযোগীশ্রেণি এবং ধার্মিক ব্যক্তি বলতে ইসলামি শাস্ত্রজ্ঞানী ও সুফি পির-দরবেশদের বোঝায়। ধার্মিক ব্যক্তির নামের আগে শায়খ, শাহ, মৌলানা, মখদুম এবং নামের পরে বংশগত ও জন্মস্থানগত পদবি সংগ্রথিত হয়েছে। বাংলার স্থাপনা ও শিলালিপি নির্মাণে তাঁদের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভূমিকা রয়েছে। বলা বাহুল্য, সুলতান বা প্রধান শাসক দীর্ঘ ও বর্ণাঢ্য উপাধি ধারণ করতেন অন্যাদের উপাধি সংক্ষিপ্ত হতো। গ্রন্থকার উপাধি ও পদবির প্রকারভেদ সম্বন্ধে বলেন, "লকব বা উপাধির শ্রেণীবিভাগ করা হত পেশা, পদমর্যাদা, দায়িত্ব ও ক্ষমতার ভিত্তিতে। মুসলিম উপাধিসমূহকে শিথিলভাবে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে, যেমনঃ ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক, রাজকীয়, পার্থিব, দাপ্তরিক, আনুষ্ঠানিক, প্রশাসনিক, পেশাগত, সামরিক, অবৈতনিক, সম্মানসূচক প্রভৃতি।" [পৃ. ২০৫]

'সুলতান' রাজকীয় উপাধি; বাংলার স্বাধীন সুলতানদের নিকট এটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। দিল্লির শাসকগণও একই উপাধি গ্রহণ করতেন। এজন্য এটি অধিক লোভনীয় উপাধি ছিল। আরবি সুলাতা শাব্দজাত সুলতান-এর আক্ষরিক অর্থ ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, অধিকার ইত্যাদি। বিবিধ গুণ ও গৌরববাচক উপাধি ধারণ করে তাঁরা প্রজার কাছে নিজেদের ক্ষমতা ও মর্যাদা জাহির করতেন। ধার্মিক পুরুষদের ক্ষেত্রে শায়খ (অর্থ- গুরু) উপাধির অধিক ব্যবহার লক্ষ করা যায়। আরবি মখদুম শব্দের অর্থ শিক্ষক, সম্মানিত ব্যক্তি। শায়খ আলাউল হক ও তাঁর উত্তরসূরিরা এই উপাধিতে ভূষিত হন। ১৫৭২ সালে প্রাপ্ত শিলালিপিতে মখদুম শায়খ নূর কুতব-ই-আলমের গুণবাচক ৮ প্রকার উপাধি উৎকীর্ণ হয়েছে, যেমন- 'সুলতান আল-আরিফিন' (সাধকদের অধিপতি), "কুতব আল আকতাব" (স্তম্ভসমূহের মুখ্যস্তম্ভ), 'কাতিল-ই-ওয়াহাব' (সর্বদাতা আল্লাহর প্রেমে উৎসর্গীকৃত), হজরত-ই-আলম (জগতে সম্মানিত ব্যক্তি নূর-অল-হক ওয়াল শরা ওয়াল দীন) (সত্য, শাস্ত্র ও ধর্মের জ্যোতি) ইত্যাদি। এরূপ জানা-অজানা বিবিধ ও বিচিত্র উপাধি ও পদবির সন্ধান পাওয়া যায় এই অধ্যায়ে। নিঃসন্দেহে এটি অতি উৎকৃষ্ট ও আকর্ষণীয় অধ্যায়।

আমরা বলেছি যে, লেখক ৭ম ও ৮ম অধ্যায়ে ১২০৫-১৪৮৮ সাল পর্যন্ত ১০৮টি শিলালিপির টেক্সট (মূলপাঠ)-সহ (প্রসঙ্গ) ও টেক্সচার বা মূলপাঠভুক্ত যাবতীয় তথ্য সুচারুরূপে আলোচনা-পর্যালোচনা করেছেন। শিলালিপির শুদ্ধ পাঠোদ্ধার একটি দুরূহ কাজ। আরবি-ফারসি ভাষাজ্ঞান ও লিপিবিদ্যা উভয় বিষয়ে পারদর্শী না হলে সম্ভব নয়। তিনি প্রতিটি শিলালিপির অনুবাদসহ আদি প্রাপ্তিস্থান বর্তমান অবস্থান উপকরণ ও পরিমাপ, লিখনরীতি ও সারিসংখ্যা, রাজত্বকাল, ভাষা ও ছন্দ, ধরন, প্রকাশনা, আলোচনা ইত্যাদি উপশিরোনামে জ্ঞাতব্য বিবিধ তথ্য পরিবেশন করেছেন। তাঁর আলোচনা অংশ তথ্যবহুল ও মনোজ্ঞ। তিনি ক্ষেত্রবিশেষে পূর্বসূরির সাথে যুক্তিতর্কসহ দ্বিমত পোষণ করেছেন।

পরিশিষ্টে 'বাংলার মুসলিম শাসকদের কালানুক্রম' ও 'বাংলার ইসলামি শিলালিপির তালিকা' শিরোনামে দুটি মূল্যবান তালিকা রয়েছে। দ্বিতীয় তালিকায় সুলতানি যুগ ও মুঘল যুগ মিলে সর্বমোট ৪২৪টি শিলালিপির উল্লেখ রয়েছে, যা পূর্বে প্রকাশিত ইংরেজি গ্রন্থে প্রদত্ত তালিকার চেয়ে অনেক বেশি।

গ্রন্থশেষে যথাবিহিত গ্রন্থপঞ্জি ও নির্ঘণ্ট রয়েছে। সুবিস্তৃত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ তালিকা লেখকের বহুলপাঠের ও জ্ঞানানুসন্ধিৎসার এবং নিবিড় নির্ঘন্ট নিষ্ঠার ও মনীষার স্বাক্ষর বহন করে।

গ্রন্থখানি পাঠ করে আমাদের মনে হয়েছে, শিলালিপির খুঁটিনাটি যাবতীয় বিষয় লেখকের নখদর্পণে। বাংলায় প্রবাদ আছে : "সাপের হাঁচি বেদেয় চিনে।", যার অর্থ- অভিজ্ঞ ব্যক্তি কোনো বিষয়ের অন্তর্গত মর্ম বুঝতে পারেন। গ্রন্থকার আরবি-ফারসি শিলালিপি দেখেই এর ভিতর-বাইরের অন্তর্নিহিত খবর বলে দিতে পারেন। এটি তাঁর নিষ্ঠার ও প্রজ্ঞার ফল, যা তিনি সারাজীবন সাধনা দ্বারা আয়ত্ত করেছেন। সুবৃহৎ এই গ্রন্থ পাঠ করে বিজ্ঞ পাঠকসমাজ একদিকে যেমন দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করবেন, অন্যদিকে তেমনি নির্মল আনন্দ ও বৌদ্ধিক সৌন্দর্য (intellectual beauty) উপভোগ করবেন বলে আমি বিশ্বাস করি। এরূপ জ্ঞানসমৃদ্ধ একখানি গ্রন্থ পাঠকসমাজকে উপহার দেওয়ার জন্য আমি গবেষক মুহম্মদ ইউসুফ সিদ্দিককে অশেষ ধন্যবাদ জানাই এবং গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

ওয়াকিল আহমদ*

* প্রাক্তন উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ